

গৈরিকা পত্রিকা ও দেশ বিভাগ-পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্বৎ সমাজের স্বদেশ ভাবনা

আনন্দ বিকাশ চাকমা*

সারসংক্ষেপ

গৈরিকা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা। চাকমা রাণী বিনীতা রায়ের পরিচালনায় ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, দেশ বিদেশের সংবাদ গৈরিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো একটি মুদ্রণ সুযোগবিহীন এলাকা থেকে মননশীল সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ পটভূমি। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা নামে পৃথক জেলা গঠন ও নবসৃষ্ট জেলার অধিবাসীদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার এবং উন্নততর কৃষি পদ্ধতি ও রাজস্বনীতি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে রচিত হয় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ভিত। সৃজ্যমান এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে বিত্ত বৈভব কেন্দ্রিক চেতনার বাইরে উন্মোচন ঘটে সমকালীন দেশ, সমাজ ও স্ব-জাতির হিতাহিত ভাবনার জগৎ। তাদেরকেই এ প্রবন্ধে ‘বিদ্বৎ সমাজ’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং গৈরিকা ছিল সেই বিদ্বৎ সমাজেরই মুখপত্র যা তাদের সমাজ, ভাষা-সংস্কৃতি ও স্বদেশ ভাবনাগুলোকে ধারণ ও প্রচার করতো। বলা বাহুল্য ব্রিটিশ আমলে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাবনাই জনভাবনা বা মত হিসেবে পরিগণিত হতো। গৈরিকা-য় প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের ‘বিদ্বৎ সমাজ’র রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি ও শিক্ষা ভাবনাগুলোকেই সামগ্রিক অর্থে ‘স্বদেশ ভাবনা’ হিসেবে এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকা

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে জনসংখ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় সবচেয়ে অগ্রসর হলো চাকমা সম্প্রদায়। চাকমা রাজা হলেন এই সম্প্রদায়ের প্রধান। পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশদের সরাসরি শাসনাধীনে এলে ব্রিটিশ শাসকদের নিকট পার্বত্য চট্টলের বিশাল অঞ্চলের প্রভাবশালী চাকমা রাজন্যবর্গের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অত্যাवশ্যক হয়ে ওঠে। ফলে চাকমা ও স্থানীয় রাজাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি লিঙ্গুয়া-ফ্রাঙ্কা বা যোগাযোগের ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় চাকমা রাজা ও রাজকুমার এবং

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চাকমা রাজার রাজস্ব প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য আধুনিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা ব্রিটিশ নীতির অংশ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সূচিত হয় গৃহীত নীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া যেখানে বাংলা এবং ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।^১ এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পার্বত্য অঞ্চলে বাংলাভাষা চর্চার শুভ সূচনা ঘটে। এর ধারাবাহিকতায় চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায় এই বিদ্যালয় থেকেই প্রবেশিকা পাস করেন এবং বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বুৎপত্তি অর্জন করেন। পরে তাঁর সন্তানদের তিনি সিমলা, দার্জিলিং এমনকি লন্ডনেও পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। এতে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটে আমূল পরিবর্তন। রাজকুমার নলিনাক্ষ রায়-এর সঙ্গে কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের নাতনী বিনীতা দেবী সেনের বিবাহবন্ধন চাকমা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাজা ভুবন মোহন রায়ের পরলোকগমনের পর বিনীতার স্বামী যুবরাজ নলিনাক্ষ রায় চাকমা রাজগদিতে অভিষিক্ত হন ১৯৩৫ সালে। রাজকীয় আচার অনুযায়ী বিনীতা রায় রাণীর মর্যাদায় উপনীত হন এবং রাণী বিনীতা রায় নামে সমাদৃত হন। অতঃপর তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের উদীয়মান শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সাহিত্যচর্চার সুযোগ সৃষ্টির একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেন— পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ‘গৈরিকা’ নামে বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশনা। ‘গৈরিকা’ নামটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেওয়া। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রি.)। প্রারম্ভিক পর্যায়ে গৈরিকা ষান্মাসিক পত্রিকা হিসেবে বের হয়। পরবর্তীকালে বার্ষিক পত্রিকা হিসেবে প্রতিবছর ডিসেম্বর বা অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। এতে রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতা, গল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হতো। পার্বত্য চট্টগ্রামের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণেরাই ছিলেন এ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। তবে সমকালীন বাংলার প্রথিতযশা পণ্ডিতবর্গও এ পত্রিকায় লিখতেন। পত্রিকাটির বিশেষত্ব হলো এটি দেশবিভাগ-পূর্ব বাংলার একটি পশ্চাত্তপদ অঞ্চলে বাংলাভাষা চর্চার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং সৃষ্টি করেছে মননশীল লেখক সাহিত্যিক গোষ্ঠী। ফলে সমকালীন শিক্ষিত সমাজের মুক্তচিন্তার বাহন হয়ে ওঠে এ পত্রিকা। তাঁরা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশ করতেন তাঁদের সম্প্রদায়, সমাজ ও স্বদেশ ভাবনাগুলো। আলোচ্য প্রবন্ধে গৈরিকা পত্রিকার পটভূমি, বিকাশ এবং গৈরিকায় প্রকাশিত দেশ-বিভাগ পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের ‘বিদ্বৎ সমাজ’ এর স্বদেশ ভাবনাগুলো তুলে ধরা হবে। পুরাতন পত্রিকার ইতিহাস পুনর্গঠনের বেলায় বলা সমীচীন যে কালের করাল গ্রাস থেকে যা বেঁচে টিকে থাকে তা দিয়েই সেই কালকে ছুঁয়ে যেতে হয়। গৈরিকার সবগুলো সংখ্যা কোথাও

সংরক্ষিত নেই তাই বিপুল শ্রম, সময় ও সাধনার বিনিময়ে যে ১০টি সংখ্যা^২ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা দিয়েই আমাদের বিভাগ-পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকাশিত 'গৈরিকা'র সামগ্রিকতাকে অনুধাবন করে নিতে হবে।

তৎকালীন বাংলায় পত্রিকা প্রকাশনার সংক্ষিপ্ত চিত্র ও গৈরিকা

বিভাগ-পূর্ব বঙ্গদেশে বাংলাভাষায় বিপুল সংখ্যক সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা ছিল বাংলাভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য সাহিত্য ও সাময়িক পত্র ও পত্রিকার জন্মভূমি। তাদের মধ্যে দীর্ঘায়ু ও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছিল হাতে গোনা কয়েকটি পত্রিকা। এ প্রসঙ্গে কলকাতা থেকে প্রকাশিত দুটি মাসিক পত্রিকা-ভারতবর্ষ ও ভারতী র কথা উল্লেখ করা যায়। প্রথমটির প্রথম সম্পাদক বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), এর পর দীর্ঘ ত্রিশ বছর সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব পালন করেন ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ভারতবর্ষ ১৯১৩ সালে জুন মাসে (১লা আষাঢ় ১৩২০ সালে) প্রথম প্রকাশিত হয় এবং অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে প্রকাশনা অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরিচালনায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত ভারতী পত্রিকার জন্ম উনবিংশ শতকে ১৮৭৭ সালে শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে। পত্রিকাটি ৫৯ বয়সের অবিরাম পদযাত্রায় জন্ম দেয় অগণিত লেখক, সাহিত্যিকের।

এর পরের ধাপে মুসলমানদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদিত মাসিক নবনূর (১৯০৩), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র হিসেবে ১৯১৮ সাল থেকে প্রকাশিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস প্রথম সংখ্যা)। অতঃপর কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় ধূমকেতু (১৩২৯ বঙ্গাব্দ) এবং ১৯২৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে লাঙ্গল। কিন্তু বোধগম্য কারণেই কবি নজরুলের পত্রিকা দুটির আয়ুষ্কাল শৈশব পেরুতে পারেনি। তাতে সাময়িক পত্র প্রকাশের গতিপথ বন্ধ হয়ে যায়নি। পূর্ববঙ্গে সঞ্চারিত হয় সেই বহমান ধারা। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯২৬ সালের ১১ই জানুয়ারী) ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সাহিত্য সমিতির কয়েকজন সদস্য হলেন কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) প্রমুখ বুদ্ধিজীবী। তাঁরা যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী পূর্ববাংলায় সাহিত্য ও চিন্তার জগতে এক সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন যা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন নামে বিখ্যাত। তাঁদের আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় প্রগতিশীল ধারার পত্রিকা শিখা। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল (বাংলা ১৩৩৩-১৩৩৮

সাল) পর্যন্ত ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় *শিখা* পত্রিকা। প্রথম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন আবুল হুসেন এবং পরের দুটির কাজী মোতহার হোসেন, চতুর্থটির আবদুর রশীদ এবং পঞ্চম খন্ডের আবুল ফজল।^৩

অতঃপর আমরা দেখি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ধারা পূর্ববাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে ছড়িয়ে পড়ে সীমান্তবর্তী মফস্বল জেলায়। ১৯৩১ সালে সিলেট থেকে নারী জাগরণের আলোকবর্তিকা লীলা নাগ প্রকাশ করেন *জয়শ্রী* নামে সাময়িক পত্রিকা যার নামকরণও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩২ সালে নুরুল হকের সম্পাদনায় মাসিক *আল-ইসলাহ* নামে আরেকটি পত্রিকা বের হয়। দক্ষিণ পূর্ববাংলার নগরকেন্দ্র চট্টগ্রাম থেকে ১৯৩৫ সালে (১৩৪২ সালে) আবদুস সালামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা *প্রতিভা*। তবে এটি খুব একটা প্রচার পায়নি বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এর পরের বছর ১৩৪৩ সালের (এপ্রিল ১৯৩৬) বৈশাখ মাস থেকে *গৈরিকা* পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে বাংলার পূর্বসীমান্ত অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে। *গৈরিকা* আত্মপ্রকাশের ছয় মাস অতিক্রান্ত হতে না হতেই একই বছর ১৩৪৩ সালের (১৯৩৬) কার্তিক মাস থেকে চট্টগ্রামের দুই স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওহিদুল আলম বি. এ. ও শ্রীআশুতোষ চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা-*পূর্ববী*।^৪ মাসিক *পূর্ববী*-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের পহেলা কার্তিক রোববার ১৭ অক্টোবর ১৯৩৬। শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৪৫ সালে। সে হিসেবে মাত্র তিন বছর আয়ুষ্কাল লাভ করে চট্টলার সাহিত্যিক মুখপত্র *পূর্ববী*। এই *পূর্ববী* পত্রিকার ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় (বৈশাখ ১৩৪৪) পুস্তক পরিচয় কলামে *গৈরিকা* পত্রিকার আবির্ভাব সম্পর্কে সম্পাদক ওহিদুল আলম প্রথম আলোচনা করেন। তিনি *গৈরিকা*-র আত্মপ্রকাশকে স্বাগত জানিয়ে স্বীয় অনুভূতি ব্যক্ত করে লিখেন:

গৈরিকা- সম্পাদক শ্রীপ্রভাত কুমার দেওয়ান; পরিচালিকা- রাণী বিনীতা রায়। ঠিকানা- দেওয়ান ভিলা, নন্দন কানন, চট্টগ্রাম। *গৈরিকা* পার্বত্য চট্টগ্রামের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাণী নিজে ইহার পরিচালনার ভার নিয়াছেন দেখিয়া পরম পুলকিত হইয়াছি এবং এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ জানাইতেছি। প্রকৃতির লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি কি জানিতে চাহিলে *গৈরিকা*ই তাহার উত্তর দিতে সমর্থ হইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস। ইহার পেছনে শক্তিশালী ব্যক্তির আছেন। রাণী নিজেও কলম ধরিয়াছেন এবং বস্তুতঃ তাঁহার লেখাই *গৈরিকা*র পৃষ্ঠে বেশী পরিমাণে দেখা দিয়াছে। কএকটি গল্প সম্বন্ধে আমাদের এই বলিবার আছে যে- আমরা ঐগুলিতে পার্বত্য অঞ্চলের বাঘের গর্জন, পাহাড়ী বরণার ঝুম ঝুম শব্দ শুনিয়াছি, যেমন “দুধারা”। জুম ও জুমিয়া, জুম ও কুমির উন্নতি ইত্যাদি প্রবন্ধে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার সুযোগ পাইয়াছি। বস্তুতঃ এরকম জিনিসই আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের মুখপত্র *গৈরিকা* হইতে প্রত্যাশা করি।^৫

একটি অনগ্রসর ও দুর্গম এলাকা থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের জন্য এ সাধুবাদ ও স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে পরম প্রাপ্তি। গৈরিকা যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সমতলের সুধীমহলে সমাদৃত হয়েছিল এ সাধুবাদ বাণী তার বড় প্রমাণ। গৈরিকা পত্রিকা প্রকাশনা অব্যাহত থাকে ১৩৫৮ সাল (১৯৫১) পর্যন্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে যারা সাময়িক পত্র নিয়ে কাজ করেছেন (মুস্তাফা নুরুল ইসলাম, ইসরাইল খান, মুনতাসীর মামুন) তাঁদের কেউই গৈরিকা পত্রিকা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন নি। হয়তো গৈরিকা সম্পর্কে তাদের কেউই অবগত ছিলেন না। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক নন্দলাল শর্মার অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর লিখিত, রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা শীর্ষক গ্রন্থে গৈরিকা-র সাহিত্যিক মানের উপর নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থটি জাতীয়ভাবে পরিচিত কোনো প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত না হওয়ায় গৈরিকা সুধীমহলের নজরে আসেনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রামের বিভাগীয় সরকারী গ্রন্থাগার, রাঙ্গামাটির স্থানীয় গ্রন্থাগার এমনকি চাকমা রাজবাড়ী গ্রন্থাগারে খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সংখ্যার হদিশ পাইনি।

গৈরিকার পরিচিতি

কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার কর্তৃক প্রকাশিত ভারতী যেমন ঐ পরিবারের মননশীল সাহিত্য সাধনার মুখপত্র তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চার বাহন ছিল গৈরিকা পত্রিকা। পূর্ববাংলায় আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাসাহিত্য চর্চার নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে গৈরিকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসরতা বিবেচনায় গৈরিকা পত্রিকা নিঃসন্দেহে পত্রিকা প্রকাশনার ইতিহাসে একটি নবতর সংযোজন। কেননা পূর্ববাংলায় সাময়িক পত্র প্রকাশের যে উদ্যোগ বিংশ শতকের বিশের দশকে শুরু হয় পার্বত্য অঞ্চল সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তার উদ্যম ও সৃজনী প্রতিভা দিয়ে। স্মরণ রাখা দরকার যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মানুষের প্রথমভাষা বাংলা নয়। সুতরাং, তাদের হাত দিয়ে বাংলাভাষায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ সত্যিই একটি অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর সাহসী পদক্ষেপ। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো গৈরিকার ভাষারীতি ছিল চলিত যা প্রমিত বাংলাচর্চার এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চাকমা রাজ-পরিবারের সৃষ্টিধর্মী ও মননশীল কর্মে পৃষ্ঠপোষকতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল গৈরিকা প্রকাশনা। তৎকালীন চাকমা রাজবধু পরে চাকমা রাণী বিনীতা রায় (১৯০৭-১৯৯০) ছিলেন এর মূল চালিকা শক্তি। মূলত তাঁর উৎসাহ, পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এ বার্ষিক পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। গৈরিকা-কে

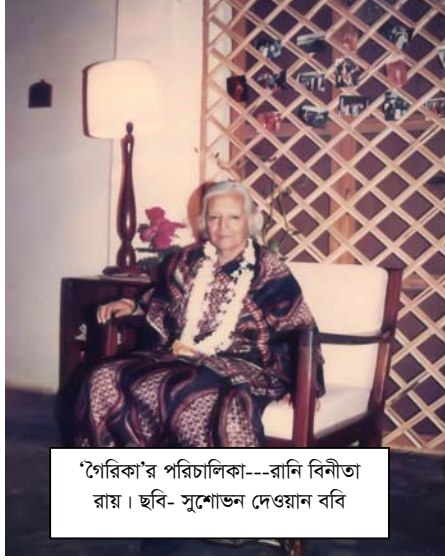
জার্নাল হিসেবে আখ্যায়িত করে এ পত্রিকা সম্পাদনায় রাণী বিনীতা রায়ের অবদানের কথা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গেজেটিয়ারেও উল্লেখ আছে:

No mentionworthy journal is published from the Chittagong Hill Tracts. However, a journal named 'Geirika' was published both in English and Bengali from the Chakma Rajbari from 1936. The journal, edited by Rani Benita Roy and Pravat Kumar Ray [Dewan] discussed many aspects of tribal culture, arts, languages, etc.^৬

কিন্তু কে এই বিনীতা? তিনি কলকাতার প্রখ্যাত ধর্ম সংস্কারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ছেলে স্বনামধন্য ব্যারিস্টার সরল সেনের কন্যা বিনীতা সেন। ১৯০৭ সালে তাঁর পিতা যখন লন্ডনে *বার এট ল* অধ্যয়নরত তখন বিনীতার জন্ম হয়। অতঃপর তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন এবং বেথুন কলেজে আই. এ. পড়ার সময় তাঁর জীবনে পরম গুণকণ্ঠটি হাজির হয়।^৭ চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায়ের (১৮৭৬-১৯৩৪) জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার নলিনাক্ষর রায়ের সাথে ১৯২৬ সালে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।^৮ পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা চাকমা জাতির ইতিহাসে একটি অভিনব এবং বিরূপ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেশবচন্দ্র সেন ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন পরমসুহৃদ তেমনি বিনীতা দেবী সেনের পিতা ব্যারিস্টার সরলচন্দ্র সেন ছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফলে উভয় পরিবারের পারিবারিক বন্ধন ছিল সত্যতঃ বহুমান। সে সূত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিনীতার পরিচয় শৈশব থেকে। সুতরাং, তিনি যখন রাজবধূ হিসেবে রাঙ্গামাটি আগমন করেন সাথে করে নিয়ে আসেন কলকাতার দুই বিখ্যাত পরিবারের প্রাণসর সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরবময় উত্তরাধিকার। *গৈরিকার* প্রসিদ্ধ লেখক ও *শ্রীশ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস* গ্রন্থের প্রণেতা মাধবচন্দ্র চাকমা ১৯৪০ সালে বিনীতা রায়ের সদগুণাবলির ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন:

মাননীয় রাণী বিনীতা দেবী ও সুধীরা দেবী উভয়েই সুশিক্ষিতা। সাহিত্যে, গানে, চারুশিল্পে পারদর্শিনী। ... ফলতঃ ঈদৃশী রূপবতী গুণবতী মহিলার সহিত কুমারযুগল উদ্ভাহ সম্মিলনে সম্মিলিত হওয়ায় রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের এবং অভিজাতবর্গের আনন্দের কারণ হইয়াছে। রাণী বিনীতা দেবী পিতৃমাতৃ উভয় বংশেরই বিভিন্ন সদগুণাবলীর অধিকারিণী হইয়াছেন। তাঁহারই সাহায্যে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র মুখপত্র “গৈরিকা” ৪ চার [সিক] বৎসর যাবৎ বাহির হইতেছে। ... ভবিষ্যতে আশা করা যায় “গৈরিকা” সারগর্ভ প্রবন্ধ সম্ভারে পরিপূর্ণ হইবে।^৯

রাঙ্গামাটিতে আসার পর তিনি পরম মমতায় আপন করে নেন তাঁর পরিবার পরিজন ও গিরিভূমি পার্বত্য চট্টলকে। তিনি লক্ষ্য করেন রাঙ্গামাটি ও রাজ পরিবারকে ঘিরে রয়েছে একটি শিক্ষিত শ্রেণী যাঁরা সাহিত্য সাধনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ নিয়ে তিনি



কেউ নাটক, কেউ অনুবাদ এভাবে সাহিত্যের নানা শাখায় গুরু হয় নবীন লেখকদের দৃষ্ট বিচরণ। ফলে আমরা দেখি রাণীর সুযোগ্য পরিচালনার পাশাপাশি গিরিকন্যা গৈরিকা-কে সম্বন্ধে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন পার্বত্য চট্টলের দুই গুণী ব্যক্তিত্ব- কবি অরুণ রায় (১৯১৪-১৯৮৩) ও লেখক, গবেষক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক শ্রী প্রভাত কুমার দেওয়ান, বি. এ. (১৯০৯-১৯৯৩)। এ দুজনের কেউই জাত-সম্পাদক নন যেমনটি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, প্রমথ চৌধুরী, আকরম খাঁ প্রমুখ খ্যাতনামা

সম্পাদকবৃন্দ। তবুও পত্রিকা প্রকাশে তাঁদের ধৈর্য ছিল অফুরন্ত, সংকল্প ছিল অটল, নিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। পত্রিকাটি চট্টগ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ, চিটাগং প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড, প্রবর্তক প্রেস ও মডার্ন প্রেস হতে মুদ্রিত হতো কেননা রাঙ্গামাটিতে কোনো ছাপাখানা ছিল না। বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সদর দপ্তর রাঙ্গামাটির চাকমা রাজবাড়ি থেকেই প্রকাশিত হয় গিরিকন্যা গৈরিকা। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা। পরবর্তী পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রতি সংখ্যায় এক টাকা। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে, অর্থাৎ, অগ্রহায়ণ মাসে 'গৈরিকা', বের হতো। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ ও শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ কাহিনী, কবিতা, গল্প ও উপন্যাস এতে প্রকাশিত হয়।

গৈরিকার নিয়মাবলি নিম্নরূপ:

- ১। যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক করা হয়। গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা।
- ২। ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ ও শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং ভ্রমণ কাহিনী; কবিতা, গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়।
- ৩। প্রবন্ধাদি অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে লিখিতে হইবে। প্রতি বৎসর ডিসেম্বর (অগ্রহায়ণ) মাসের দিকে 'গৈরিকা' বাহির হইবে। উচিত মত ডাক টিকেট না দিলে অমনোনীত

লেখা ফেরৎ দেওয়া হইবে না। কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না।

৪। যাবতীয় চিঠিপত্র এবং বিজ্ঞাপন ও তৎসম্বন্ধীয় টাকা পয়সা সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হবে।

৫। সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

বিজ্ঞাপনের হার— পূর্ণ পৃষ্ঠা— ১২, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা— ৬, সিকি পৃষ্ঠা— ৩

ঠিকানা— সম্পাদক, ‘গৈরিকা’ রাঙ্গামাটি রাজবাড়ী, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

পত্রিকাটির প্রথম বর্ষের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে)। ‘গৈরিকা’ নামকরণ এবং পত্রিকা প্রকাশনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রথম সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ^{১১}

বড় আশা করিয়া আমরা পার্বত্যবাসীর কৃষ্টি ও জ্ঞানের উন্নতির জন্য ‘গৈরিকা’ নামক একখানা পত্রিকা বাহির করিলাম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রিকার নাম দিয়েছেন—‘গৈরিকা’। তজ্জন্য আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা তাঁহার নিকট চিরঞ্চণী ও চির কৃতজ্ঞ। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য হইল পার্বত্যবাসীর সাহিত্য অনুশীলনের সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা, যাহাতে এই পত্রিকার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের অন্তররাজ্যের নিজস্ব সূক্ষ্ম মনোভাবগুলিকে মসীর সাহায্যে রূপান্তরিত করিতে পারেন। ইহার ফলে, তাঁহাদের সাহিত্য চর্চার স্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে, তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন প্রতিভার বিকাশ হইবে, এবং মনোজগতের বেসুর গানগুলি সুরে বাঁধা হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া পত্রিকাখানি বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইল। ‘গৈরিকা’ পত্রিকাখানি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম পত্রিকা। ইতিপূর্বে পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা আর কোন দিন হয় নাই। এই চেষ্টাই আজ প্রথম চেষ্টা। সুতরাং এই পত্রিকাকে বাচাইয়া রাখিবার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসাধারণের সহানুভূতি ও উৎসাহ নিতান্ত প্রয়োজন, এবং এই জন্য তাঁহাদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।



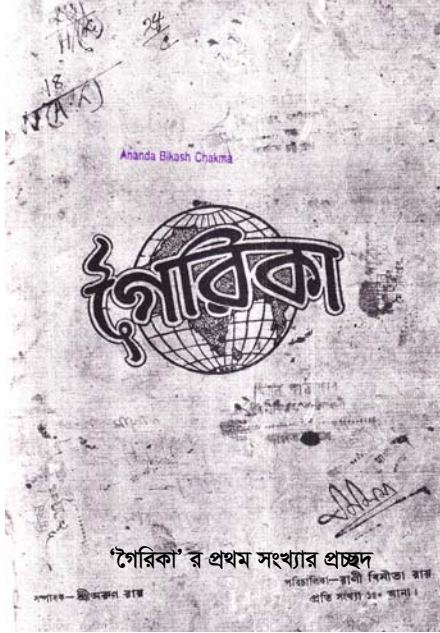
গৈরিকার সম্পাদক: প্রভাত কুমার দেওয়ান বি.এ.



গৈরিকার সম্পাদক: কবি অরুণ রায়

প্রভাত কুমার দেওয়ান গৈরিকার প্রথম সংখ্যায় “উদ্বোধন” শীর্ষক লেখায় গৈরিকার ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে যে গভীর আশাবাদ ব্যক্ত করেন তা শিক্ষিত সচেতন বিদ্বৎ সমাজের চিন্তা জগতে আধুনিকতা ও উৎকর্ষের পরিচায়ক। তিনি লিখেছেন:

বিশ্ব জগতও এই চলার নেশায় আজ আত্মহারা, নব-জাগরণের বিরাট সাড়া সে পেয়েছে—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সে জাগরণের আলো আজ উদ্ভাসিত। সে আলোর মায়া আজ পাগল করে তুলেছে সবাইকে— ছুটে চলেছে বিশ্ব-আঙিনায় মহামিলনের আশায় বুকে সাহস বেঁধে, হৃদয়ে প্রবল আশা নিয়ে। মহা মিলনের জাগরণ জনিত যে ব্যস্ততার তীব্র কোলাহলে সারা জগতের আকাশ বাতাস ছেয়ে গেছে, আজ সে ব্যস্ততার অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা বঞ্চিত নিভৃত শৈলবাসীর কুটার দ্বারে উপস্থিত। ... তাই আজ শৈলবাসীর “গৈরিকা” আত্মপ্রকাশ করল শৈলবাসীদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে। শৈলজাতির পক্ষে এ প্রচেষ্টা একান্ত দুঃসাহসিক হলেও এর পশ্চাতে যে রয়েছে তাদের সর্বস্বীন উন্নতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর স্থির সংকল্প— এ সত্যটা কে অস্বীকার করবে? “গৈরিকা” তার গৈরিক পতাকা উড্ডীন করে প্রচার করুক— তার উন্নতির বাণী, ঘোষণা করুক তার সভ্যতার মহিমা— শৈলপ্রদেশের প্রতি কান্তারে প্রতি কন্দরে আর প্রতি উপত্যকায়। “গৈরিকা” আজ যে কৃষ্টি ও জ্ঞানের আলো জ্বলেছে তার প্রভাবে আমাদের শৈল জাতীয় জীবন যেন ফুলে ফলে রূপান্তরিত হয়ে মঙ্গলময়, আনন্দময় ও জয়যুক্ত হয়ে উঠুক!^{১২}



এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলার সীমান্তে একটি অ-বাংলাভাষী অঞ্চল। যে এগারটি জাতিসত্তার লোকজন এ অঞ্চলে বসবাস করে তাদের কারো প্রথমভাষা বাংলা নয়। সুতরাং, বাংলা তাদের দ্বিতীয় অধীত ভাষা। জেলায় বাংলা ভাষা চর্চার কোনো উচ্চতর বিদ্যাপীঠ নেই। ছিল একটি মাত্র সরকারি স্কুল। ঐ স্কুলে অধ্যয়ন কালে পার্বত্যবাসীদের বাংলা ভাষায় হাতে খড়ি হয়। কলেজ পর্যায়ে পড়াশুনার জন্য তাদেরকে চট্টগ্রাম জেলা বা কলকাতায় পাড়ি জমাতে হয় যা আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক মেধাবী ছাত্রেরই পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। যে কজন ছাত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চট্টগ্রাম, কলকাতা বা অন্য কোথাও অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ

করেছে তারাই এ ‘গৈরিকা’ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বয়সে যেমন কাঁচা, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গরিমায় তাদের সীমাবদ্ধতা অনুধাবনীয়। তাছাড়া পত্রিকা পরিচালনার কাজ একেবারে কঠিন শ্রম ও ব্যয়সাধ্য কাজ। অনেকে পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করে, নানা প্রতিকূলতায় মাঝ পথে হাল ছেড়ে দেন— এ ধরনের দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি। অর্থশক্তি, মেধাশক্তি, সৃজনশীলতা ও দক্ষতার পাশাপাশি দরকার বৌদ্ধিক পাঠক মহল। না হলে পাঠকের অভাবে পত্রিকা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ছাপাখানা ছিল না, না ছিল আশানুরূপ পাঠক সমাবেশ। পত্রিকা সম্পাদনা, প্রকাশনার মতো গুরু দায়িত্ব পালনের মত অভিজ্ঞতাও ছিল না তাদের। এতসব বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে ‘গৈরিকা’ প্রকাশনা যে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়েও অব্যাহত রাখা গেছে তা নিঃসন্দেহে পার্বত্যবাসীর জন্য একটি বিস্ময়কর সাফল্য। নিম্নের সারণি থেকে প্রকাশিত ‘গৈরিকা’র পরিসংখ্যান পাওয়া যায়:^{১৩}

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৪৩ (এপ্রিল ১৯৩৬ খ্রি.)

১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা: কার্তিক ১৩৪৩

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩৪৪

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

৪র্থ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩৪৬

৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা: অগ্রহায়ণ ১৩৫০

৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা: মাঘ ১৩৫১

১০ বর্ষ ১১ শ সংখ্যা : মাঘ ১৩৫২

১১ শ বর্ষ ১২ শ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

১২ শ বর্ষ ১৩ শ সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

সর্বশেষ সংখ্যা: ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ‘বিদ্বৎ সমাজ’

ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে বিংশ শতকের তিনের দশকের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী সমাজে রূপান্তরের ক্ষেত্রগুলো দৃশ্যমান হতে শুরু করে। সমাজের মধ্যে স্তরবিন্যাসটি গাঢ় হয়। গড়ে উঠতে শুরু করে একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। শিক্ষিত শ্রেণীরই একটি অংশ

তাদের অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান আদিবাসী সমাজদর্শন নিয়ে ভাবতে থাকে; এবং তাদের ভাবনাগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কালি ও কলমের আশ্রয় নেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ‘বিদ্বৎ সমাজ’ বলে বিবেচনা করেছি। তবে জুমিয়া আদিবাসী সমাজে কীভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আত্মপ্রকাশ করে এবং ধীরে ধীরে বিকশিত হতে শুরু করে তার একটি ঔপনিবেশিক পটভূমি রয়েছে। সে প্রসঙ্গে এখানে আলোকপাত করা হলো।

আগেই বলা হয়েছে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে ব্রিটিশ সরকার একটি পৃথক জেলা গঠন করে। এর বছর দুয়েক এর মধ্যে, অর্থাৎ, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা সদর চন্দ্রঘোনায় একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এটি ছিল এ অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। এর আগে এ অঞ্চলে কোনো স্কুল ছিল না। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে স্কুলটি ১৮৯০ সালে হাই ইংলিশ স্কুলে উন্নীত হয় এবং শুরু থেকে সরকারই সমস্ত খরচাদি বহন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল ও সচেতন পরিবারের মেধাবী সন্তানেরা এ স্কুলে পড়াশুনা করতে থাকে। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজ পরিবারের সদস্যবর্গ, অভিজাত দেওয়ান পরিবারের সন্তান এবং রাজবাড়ীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাকমা পরিবারের সন্তানেরা এখানে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করেন।^{১৪} একথা বললে অত্যাুক্তি হবে না যে ১৮১৭ সালে কলকাতার হিন্দু কলেজ বাঙালি হিন্দু সমাজে আত্মচেতনা ও আত্মশক্তি বিকাশের জন্য যে ভূমিকা পালন করেছে রাঙ্গামাটি হাই ইংলিশ স্কুলও পার্বত্য চট্টগ্রামে আবদ্ধ জীবনবোধ ও মননজগতের নবদুয়ার খুলে দেয়। পরবর্তীকালে পার্বত্যবাসীদের মধ্যে যারা কবি, লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন এবং যারা ব্রিটিশ প্রশাসনের বিভিন্ন অফিসের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন তার সিংহভাগ যোগান দিত এ রাঙ্গামাটি হাই ইংলিশ স্কুল।

ব্রিটিশেরা পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের সরাসরি শাসনাধীনে আনার পর তথায় উপজাতীয় রাজাদের ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনকে সংস্কার সাধন করে একটি বিশেষ ধরনের ভূমি ও রাজস্ব প্রশাসন চালু করে। ১৮৮১ সালে যেটি উপজাতীয় গোত্র ভিত্তিক প্রশাসন থেকে একটি অঞ্চলভিত্তিক সার্কেল প্রশাসনের রূপলাভ করে। অতঃপর ১৮৯২ সালে *রুলস ফর দ্য এডমিনিস্ট্রেশন অব দ্য চিটাগং হিল ট্রাস্টস* বিধি বলে পার্বত্য জেলায় মৌজা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মৌজা ছিল ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার স্থানীয় প্রশাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট। কারণ বিশেষ শাসনাধীনে থাকায় এখানে ইউনিয়ন বোর্ড ব্যবস্থা কার্যকর ছিল না। ১৯২৬ সালের মধ্যে সমগ্র পার্বত্য জেলায় ৩৭৩টি মৌজা গঠিত হয় যার মধ্যে চাকমা

সার্কোলে গঠিত হয় সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১৭৮ টি মৌজা।^{১৫} প্রতি মৌজায় একজন করে হেডম্যান নিযুক্তি লাভ করেন যার অবস্থান মর্যাদা চীফের অধীনে। এ সার্কোলে চীফ এবং মৌজা প্রধানগণ খাজনা মওকুফ পাওয়ার পাশাপাশি স্থায়ী জীবিকা নিবাহের লক্ষ্যে ভোগ দখলের জন্য কিছু (২৫ একর) ভূ-সম্পত্তি লাভ করে যা যথাক্রমে ‘খাস মৌজা’ ও ‘সার্ভিস ল্যান্ড’ নামে তাদের দেওয়া হয়। ব্রিটিশের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ১৮৭৩ থেকে জুমিয়া পরিবার প্রতি বাৎসরিক চার টাকা হারে জুমকর আদায় করত উপজাতীয় প্রথাগত প্রশাসনের সহযোগিতায়। ঐ জুমকর আদায়কারী দেওয়ান বা হেডম্যানগণ প্রতি চার টাকায় এক টাকা করে এ জুমকর এবং চারদিন বেগার শ্রম বা অনাদায়ে ১ টাকা কমিশন লাভ করতেন। তখন চার টাকায় ১৬ আড়ি ধান ক্রয় করা যেত। খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট কমিশন পেতেন চীফ ও হেডম্যানগণ। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী উদ্যোগে হালকৃষি চালু করা হয়। চট্টগ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অনুসৃত নোয়াবাদ বন্দোবস্ত ব্যবস্থার মতো এখানেও উপত্যকাক্রান্ত সমতল জঙ্গল জমি হালচাষের আওতায় আনার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট তালুক দেওয়ান নীলচন্দ্র দেওয়ান, ত্রিলোচন দেওয়ান, রাজচন্দ্র দেওয়ান ও স্বয়ং রাজা হরিশ্চন্দ্র হালচাষের জন্য সরকারের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে বাঙালি শ্রমিক নিয়োগ করে হালচাষ শুরু করেন। ১৯১৯ সালে হালকৃষি জমি ইজারার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬,৪৬৩-টিতে এবং জমি আবাদের আওতায় আসে ৪২৬৬৭ একর। ঐ জমি থেকে রাজস্ব উসূল হয় ৭৫,০০০ হাজার টাকা।^{১৬} এভাবে আরও বেশ কয়েকটি পরিবার বিশাল জমির মালিকানা লাভ করে আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করেন। সুতরাং, হেডম্যান হিসেবে সরকারী ভাবে প্রাপ্ত ২৫ একর জমি, জুম কর ও ভূমি রাজস্ব আদায়জনিত কমিশন থেকে প্রাপ্ত আয় ও স্থায়ী বিনিয়োগ থেকে আয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে চাকরি থেকে প্রাপ্ত আয় সবমিলিয়ে বিত্তের যোগান হয় লক্ষণীয়ভাবে। অন্যদিকে সরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে বিদ্যার সমাবেশ ঘটে। সুতরাং, বিত্ত এবং বিদ্যা দুটির সহযোগে সমাজের মধ্যে নতুন সমাজের গোড়া পত্তন হয়।

এভাবে বিংশ শতকের তিনের দশকের মধ্যে ভূমি ও রাজস্ব, শিক্ষা, চাকরিকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামেও একটি ‘ল্যান্ডেড জেন্দ্রি’ বা ভূমি-কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে। তারা স্থায়ী সন্তানদের ব্রিটিশ সরকারের পরিচালিত স্কুলে প্রেরণ করে অধ্যয়ন করার ব্যবস্থা করে; এবং আরো উচ্চতর শিক্ষার জন্য চট্টগ্রামের আশুতোষ কলেজ বা কলকাতা, দার্জিলিংস্থ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে। পরে ঐ শিক্ষিত তরুণেরা সরকারের বিভিন্ন অফিস আদালতে, স্কুলে চাকরি লাভ করে। এ চাকরিজীবী ও পেশাজীবী, রাজ পরিবার, দেওয়ান পরিবার নিয়েই একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব

ঘটে। এ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ সমাজের জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনার কাজে সম্পৃক্ত হয়, তাদেরকেই ‘বিদ্বৎ সমাজ’ (ইন্টেলিজেনশিয়া) বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। কারণ Karl Mannheim ঠিক এই সময়ে, অর্থাৎ, ১৯৩৬ সালে তাঁর *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge* (London, 1936) শীর্ষক গ্রন্থে সমাজের এ ধরনের অংশকে ‘Intelligentsia’ বা ‘বিদ্বৎ সমাজ’ বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে, ‘প্রত্যেক সমাজে নানাগোষ্ঠীভুক্ত এমন কিছু লোক থাকেন, যাঁদের কাজ হল সেই সমাজের জীবন দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করা এবং ব্যাখ্যা করা। যাঁরা সমাজের এই জীবন দর্শন ব্যাখ্যা করেন, তাঁরাই ‘বিদ্বৎসমাজ’ের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। তাঁরাই প্রকৃত বিদ্বৎজন।’^{১৭} যাদের এ প্রবন্ধে ‘বিদ্বৎসমাজ’ের প্রতিভূ হিসেবে ধরা হয়েছে তাঁরা আর্থিক সচ্ছলতা লাভের পাশাপাশি মেধা, মননশীলতা ও সংস্কৃতি চর্চায় পূর্ণতা সন্ধানে উদ্দীপ্ত হয়। নিজেদের সমাজ, সম্প্রদায়, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে লেখনীর মাধ্যমে বহির্জগতের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কিন্তু নিজেদের কোনো সাহিত্য ও সাময়িক পত্র না থাকায় তাদের আত্মোপলব্ধি প্রকাশের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অবদমিত অবস্থায় ছিল।

১৯২৫ সালের ঠিক এমনি এক সময়ে চাকমা রাজবাড়িতে রাজপুত্র বধূ হিসেবে আগমন ঘটে কলকাতার বিখ্যাত ধর্ম ও সমাজসংস্কারক কেশবচন্দ্র সেনের নাতনী বিনীতা দেবী সেনের। চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাজকুমার নলিনাক্ষ রায়ের সাথে বিনীতা দেবী সেনের বিয়ে দেন। বিনীতা দেবী সেন ১৯০৭ সালে ১৮ আগষ্ট লন্ডনে জন্ম গ্রহণ করেন। আবার শৈশবে কলকাতার উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেন। সুতরাং, বাংলা, বাঙালি এবং বিলেতি সংস্কৃতি দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ঘন সবুজ শৈল দেশে রাজবধূ হিসেবে এসে তিনি সে উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির দ্যুতি ছড়িয়ে দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বামী ও তৎকালীন চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়ের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। অধিকন্তু রাজা নলিনাক্ষ রায় রচিত ইংরেজি ও বাংলা বেশ কিছু জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ *গৈরিকা*-য় প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ। সাহিত্যের মাধ্যমে সুকুমার বৃত্তিচর্চা যেমনি বহুমাত্রিকতা লাভ করে তেমনি সাহিত্যে সমাজজীবনের বিচিত্র চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। মানুষের মনের আবেগময় অনুভূতি, জীবনবোধ, ভূত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, সমকালীন বাস্তবতা প্রভৃতি সাহিত্যের মাধ্যমে মনোজ্ঞভাবে চিত্রিত করা যায়। এর মাধ্যমে সহজে মানবমনকে প্রভাবিত করাও সহজ হয়। এসব দিক লক্ষ্য করেই রাণী বিনীতা রায় এতদাধিকারে সাহিত্যানুশীলনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেন। সেটিই হল

গৈরিকা। অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা যথার্থই বলেছেন, ‘এই পরিস্থিতিতে ‘গৈরিকা’র প্রকাশনা বিধাতার আশীর্বাদের মত সাহিত্যমোদীদের কাছে নন্দিত হয়।’^{১৮}

এ গৈরিকা পত্রিকা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্বৎসমাজের মুখপত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে ব্রিটিশসরকার ঘোষিত ‘ব্যাকওয়ার্ড এরিয়া’ বা ‘এক্সক্লুডেড এরিয়া’ অভিধাটি গ্রহণ করলে এখানে বিদ্বৎসমাজের অস্তিত্ব কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু এটি নিরেট সত্য যে পৌর ও নাগরিক সুবিধাদি বিবেচনায় এবং ভৌগোলিক ও স্থানিক বাস্তবতায় এবং সিংহভাগ অধিবাসীর জীবিকানির্বাহের উপায় বিচার করলে শুধু নয় রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার স্তর বিবেচনায়ও অঞ্চলটিকে পশ্চাৎপদ করে রাখা হয়েছে। অন্য দিকে এটিও স্বীকার্য যে ১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর সময়ান্ত্রে একটি প্রজন্ম বিদ্বৎসমাজ হিসেবে আবির্ভূত হন যারা শুধু নিজেদের ভাষা-



সাহিত্যিক কুমার কোকনদাক্ষ রায়, এম.এ.।
ছবি- সুশোভন দেওয়ান ববি সংগ্রহ।

কাপড়ের বৈষয়িক চিন্তা না করে দেশ ও সমাজ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। এদের অনেকে স্থানীয় রাঙ্গামাটি হাইস্কুলে পড়াশুনা সম্পন্ন করে চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলকাতায় উচ্চতর পথার্যে পড়াশোনা করে কৃতবিদ্য হন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৩৮ সালে কুমার কোকনদাক্ষ রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রথম এ ডিগ্রী প্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেন।

উপরন্তু অনেকে ফাস্ট আর্ট ও বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে শিক্ষিত সমাজের আকার বৃদ্ধিসাধন করেন। তাঁদের মধ্যে যারা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় লেখালেখির পাশাপাশি আপন আপন দেশ, সমাজ ও সম্প্রদায়ের ভালো-মন্দকে উপজীব্য করে মসি চালিয়ে কিছু নির্মাণ করেছেন এবং যাঁদের নির্মিতি কিছুটা হলেও জনমতকে ভাবিত করেছে তাঁরা নিশ্চয় কার্ল ম্যানহেইমের সংজ্ঞানুসারে বিদ্বৎসমাজের অংশবলে পরিগণিত হতে পারেন। উল্লেখ্য যে বিনয় ঘোষ প্রথম ইন্টেলিজেনসিয়া প্রত্যয়টির প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় ‘বিদ্বৎসমাজ’ কথাটি প্রচলন করেন।^{১৯}

গৈরিকার নিয়মিত লেখক যারা: রাণী বিনীতা দেবী, কুমার কোকনদাশ রায়, কবি অরুণ রায়, সলিল রায় এঁরা প্রত্যেকেই সাহিত্যের নানা শাখায় লিখে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতেন। তাঁদের চিন্তনজগতে উদিত ভাবনাগুলো তাঁরা কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক নানা আঙ্গিকে প্রকাশ করতেন। অন্যান্যের মধ্যে রাজা নলিনাক্ষ রায়, কুমার ত্রিদিব রায়, প্রভাত কুমার দেওয়ান বি.এ., বিপুলেশ্বর দেওয়ান, নীরোদরঞ্জন দেওয়ান, বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান, মাধবচন্দ্র চাকমা কর্মী, চিত্র শিল্পী চুনিলাল দেওয়ান, মুকুন্দ তালুকদার, রাজেন্দ্র নাথ তালুকদার, শ্রী কালাঞ্জয় চাকমা প্রমুখ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের অতিথি লেখক, পণ্ডিতবর্গও গৈরিকা-য় লেখা পাঠিয়ে গৈরিকা-র মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করতেন। ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মহাজাতি সদন’ নামে একটি ভাষণ প্রকাশিত হয়। এছাড়া মিসেস সরোজিনী নাইডুর লেখাও গৈরিকার গৌরব ও মান দুটোই বৃদ্ধি করত। তবে ‘গৈরিকা’য় লেখা দিয়ে গৈরিকাকে ধন্য করেছেন বিখ্যাত ভারতভবিদ আচার্য ড. বেণীমাধব বড়ুয়া। এছাড়া অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ এম.এ. সুকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ যশস্বী লেখকগণও গৈরিকায় লিখতেন।

বিদ্বৎসমাজের স্বদেশ ভাবনা

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশভারত শাসনের জন্য ভারত শাসন আইন পাস হয়। এ আইনের রাজনৈতিক, সাংবিধানিক গুরুত্ব অপরিসীম। এ আইনে সীমিত আকারে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ সমূহে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের বিধান রাখা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ব্রিটিশভারতের বিশেষ কতকগুলো অঞ্চলকে এ রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। অন্য কথায় সেসব জেলায় ভোটাধিকার যেমন স্বীকার করা হয়নি, তেমনি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার এবং আইনসভা থেকেও তাদের বহির্ভূত রাখা হয়। এমন বাস্তবতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্তরটি সহজে অনুমেয়। অঞ্চলটি ব্রিটিশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ বাংলার সীমানায় অবস্থিত হলেও বাংলা প্রদেশে প্রদত্ত ভোটাধিকার ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুফল থেকে পার্বত্যবাসী বঞ্চিত থেকে যায়।

কিন্তু সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার রক্ষণদ্বার নীতি অবলম্বন করেনি। ফলে, পার্বত্যবাসী রাজনৈতিক বঞ্চনার যাতনা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে পূরণের প্রয়াস চালিয়েছে। গৈরিকা তাঁদের মনোবেদনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তাঁদের ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করে হালকা হবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং একে অপরকে আরো কাছে আসার সুযোগ দিয়ে একত্রিত হবার মঞ্চ তৈরী করে দিয়েছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য জেলাকে প্রশাসনিক ভাবে বাংলা ও বাঙালিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন

করে দিলেও ‘গৈরিকা’ উভয়ের মাঝে সেতু বন্ধন রচনা করেছে। কারণ ‘গৈরিকা’ বাঙলার আত্মা, বাঙালির মাতৃভাষাকেই ধারণ করেছে নিজেকে মেলে ধরার বাহন হিসেবে। এজন্য বাঙলা ও বাঙালির চির-গৌরব কবিকুলের চূড়ামণি রবীন্দ্র প্রয়াণে পার্বত্যবাসী প্রকাশ করেছে ‘গৈরিকা’র বিশেষ সংখ্যা। এটি কি বাঙলা ও বাঙালির সাথে পার্বত্যবাসীর আত্মার সংযোগ নয়? যাহোক তাদের স্বদেশ ভাবনার মধ্যে মূলত তাদের দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কিত ভাবনাগুলো নিয়ে একটি পর্যালোচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

অর্থনৈতিক ভাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভৌগোলিকভাবে সমতল থেকে প্রাকৃতিক সীমারেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন জনপদ। এখানকার জনমানুষের অর্থনীতি জুম কৃষি নির্ভর। একমাত্র কৃষিই তাদের জ্ঞান, ধন, মান, কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্যের উৎসভূমি। কিন্তু জুমের জমি এবং ফলন দুটোই কমে আসাতে পার্বত্যবাসীদের অর্থনৈতিক জীবনে মন্দাভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে স্মরণাতীত কাল থেকে জুমের ফসলের মাধ্যমে জীবন জীবিকা নিশ্চিন্তে নিবাহঁ করে আসা পার্বত্যবাসী কখনো অন্য পেশা বা উপায় অবলম্বন করে জীবিকা নিবাহঁের চিন্তা করেনি। জুমই ছিল তাদের জীবন-মরণ, ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু চলমান বাস্তবতায় তাদের শুধুমাত্র জুমের ফসল দিয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বিদ্বৎসমাজ এ নিয়ে বিকল্প পথের সন্ধান করতে থাকে, এবং তাঁদের লেখার মাধ্যমে স্থায়ী সমাজের মানস প্রকৃতিতে পরিবর্তনের কথা বলে। শ্রী নীরোদরঞ্জন দেওয়ান বি. এ. বি. টি, তাঁর “পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর অর্থ সমস্যা” প্রবন্ধে জুমকৃষি ব্যতীত নানাবিধ বিকল্প উপায়ে জীবিকা নিবাহঁের কথা বলেছেন। এখানে পর্যবেক্ষণটি তুলে ধরা যাক:

টাকা পয়সা উপার্জন করিবার আমাদের অবলম্বন ছিল জুম। জুমে যাহা উৎপন্ন হইত তাহাতে সংসার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত; বাৎসরিক খরচ মিটাইয়া হাতেও কিছু জমা থাকিত। সে দিন আর নাই; দুইগুণ তিনগুণ জুম করিয়াও সংসার চলিতেছে না। এখন আর জুম আয়ের নিশ্চয়তা নাই। আড়ি প্রতি একশ [ধান] এখন স্বপ্ন মাত্র।” ... বর্তমানে আমরা এমন সঙ্কীর্ণ আশিয়া পড়িয়াছি যে, চিরদিন যে জুমের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছি উহার মায়াও ত্যাগ করিতে পারিতেছি না অথচ বাৎসরিক খোরাকও উৎপন্ন করা সম্ভব হইতেছে না। প্রতি বৎসর বুকভরা আশা লইয়া জুম কাটা হয়, প্রতি বৎসরই নিরাশ হইতে হয়। এখন জিজ্ঞাসার বিষয় আমাদের কী করা উচিত?^{২০}

তাঁর বক্তব্যে এটা সুস্পষ্ট যে জুম কৃষির উপর নির্ভর করে পার্বত্যবাসীরা আর স্বচ্ছন্দে জীবনধারণ করতে পারছে না। সংসারে অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী। অন্যদিকে সভ্যতা দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা-দীক্ষা, অসুখ-বিসুখ, আপদ-

বিপদ মোকাবেলায় অর্থের প্রয়োজন অপরিহার্য। সুতরাং, জুম দিয়ে আর সব খরচাদি মেটানো তাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। এজন্য তিনি বিকল্প আয়ের পথের সন্ধান দিয়েছেন যা লোক লজ্জা, প্রাচীন সংস্কারাদি ঝেড়ে ফেলে পার্বত্যবাসীদের হুঁট চিড়ে গ্রহণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে:

পার্বত্য চট্টগ্রাম জিলার পরিমাণ পাঁচশত বর্গমাইল বাজার সংখ্যা ২৬ এবং গৃহস্থের সংখ্যা ৩৮৫০৮। গৃহস্থ পিছু প্রতি বৎসর গড়ে তিন খানা দা প্রয়োজন হইলে প্রতি বৎসর ১১৫৫২৪ খানা দা আমরা ক্রয় করিতে বাধ্য হই। একখানা দা এর মূল্য গড়ে আট আনা ধরা গেলে, কোদাল, প্রভৃতির দাম বাদ দিলেও দা এর বাবদ প্রতি বৎসর আমাদের খরচ করতে হয় মোট ৫৭৭৬২ টাকা। প্রতি বৎসর এই টাকাগুলি নিজের হাতে রাখতে পারিলে আমরা কী না করতে পারি? ... নিজেরা এই সকল যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিলে এই টাকা গুলি আমরা পাইতাম। এই সকল যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে শিক্ষা বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে এবং বেশি সময়েরও প্রয়োজন হয় না। এক বৎসর শিক্ষাই যথেষ্ট।^{২১}

তিনি কামারের কাজ শেখার কথা বলেছেন। এছাড়া তিনি পেসেঞ্জারী নৌকা চালানো বা মাঝির কাজ, ধান গোলা বা ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন যার মাধ্যমে সাক্ষাৎ আয় রোজগার সম্ভব। ধর্মগোলা প্রতিষ্ঠা করে অভাব অনটনের সময় খোরাকী ধানের সংস্থানের লক্ষ্যে তিনি নিম্নরূপ প্রস্তাব করেছেন:

ধর্মগোলার নক্সা এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে। ধানকাটা শেষ হইলেই গ্রামের সকলে মিলিয়া যে বৎসরের ধান পাইবে এবং যে পরিবার বৎসরের ধান পাইবে না উভয়কেই নির্দিষ্ট স্থানে ধান জমা রাখিতে হইবে। একমাত্র জুম কাজের সময়েই নির্দিষ্ট হারে ধার কিম্বা নগদে ধর্মগোলা হইতে ধান দেওয়া হইবে। ফসল উঠিলেই পরিশোধ করিতে হইবে। ধর্মগোলা পরিচালকদের বোঝাপড়া থাকা চাই নতুবা উহা হইতে কোন উপকার পাওয়া যাইবে না। দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় ধর্মগোলায় অনেক উপকার দিতেছে। ধর্মগোলা মহাজনী নহে, পরস্পরকে সাহায্য করিবার উপায় মাত্র।^{২২}

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এটা পরিষ্কার যে, তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণীর লোকজন শুধুমাত্র তাদের আপন আপন স্বার্থ না ভেবে সকল জাতির স্বার্থের, মঙ্গলের কথা ভাবতেন। লেখক বিংশ শতকের ঔপনিবেশিক আমলে যা চিন্তা করেছেন তা বর্তমান একবিংশ শতকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। লেখকের চিন্তা শুধু উপরে বর্ণিত কয়েকটি আয়ের পথ প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তিনি সুতাকাটা, বেত ও বাশের কাজ, কাঠের কাজ, নৌকা সাম্পান তৈরী বিদ্যা বা কারিগরী কৌশল, শিং-এর কাজ প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন।^{২৩} শ্রী গোপালচন্দ্র গুখার্মা “কয়েকটি কুটির শিল্পের কথা” প্রবন্ধে কুটির শিল্পের দিকে জেলাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে: “... দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে হলে কৃষির সাথে সাথে আর একটা জিনিষের প্রয়োজন— সেটি হল কুটির শিল্প। . . . পল্লীর সর্বাসীন মঙ্গল ও

উন্নতি কৃষি কার্যের অবসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের উপর নির্ভর করে।”^{২৪} কৃষিবিদ কুমার বিরূপাক্ষ রায় তাঁর ‘পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম ও কৃষির উন্নতি’ নিবন্ধে ফলচাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ফলের মধ্যে লিচু চাষই লাভজনক বলে উল্লেখ করেছেন। শেষে তিনি বেকার যুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

তাই বেকার ভদ্র যুবকদের আমি চাকরী ও পরের উমেদারি না করিয়া বাগান করিয়া উপার্জন করা বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া বিবেচনা করি। বিশেষতঃ এই জেলায় হাজার হাজার একর অনাবাদী বা পতিত জমি রহিয়াছে। এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।^{২৫}

ঘনশ্যাম দেওয়ান, “ব্যবসা ও বাণিজ্যে পার্বত্যবাসীরা পশ্চাৎপদ কেন” শীর্ষক প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের উপর জোর দেন। তিনি সংকোচ বেড়ে ফেলে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁর হৃদয়গ্রাহী আহ্বানটি নিম্নরূপ:

‘আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া হাঁটুর উপরে কাপড় তুলিয়া যাহারা অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবে না তাহাদিগকেই আমি কারবারে নামিতে আহ্বান করি। উপযুক্ত অনুবক্তের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে ঘরে ঘরে আবার আনন্দ কোলাহল জাগিয়া উঠিবে এবং ধন সম্পদে বিভূষিতা হইয়া পার্বত্য জননী অপূর্ব শোভা ধারণ করিবেন।’^{২৬}

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ চিন্তাবিদগণ শুধু যে কাগজে পরামর্শ দিয়েই নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করতেন তা নয়। সেটা করেও দেখিয়েছেন। সেজন্য আমরা দেখি কামিনীমোহন দেওয়ানের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘হিলম্যান ট্রেডিং কোম্পানি’ নামে সমবায় প্রতিষ্ঠান, আর রাজবাড়ির সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম তৈলের কল ‘রাজা ভুবন মিল’। আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে স্বাবলম্বী হওয়ার যে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন তা যুগভেদী ও প্রাচ্যের চিন্তার পরিচায়ক।

রাজনৈতিক ভাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার দিকে সমতল বাংলা থেকে বহুযোজন পিছনে পড়েছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের চারিত্রিক সারল্য, জাতিগত ও ভাষাগত ভিন্নতা এবং ভৌগোলিক দুর্গমতাকে পুঁজি করে সমতলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সামন্ত ধাঁচের উপজাতীয় রাজাগণ যাঁরা জেলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁরা এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। তাঁদের প্রজাসদৃশ জনগণকেও এর সুফল-কুফল সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। স্বল্প চাহিদা ও অল্পে তুষ্ট শৈলবাসীও রাজাদের উপরে তাদের ভাগ্য ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিধ্বংসমাজের অবস্থান ছিল একটু ভিন্ন প্রকৃতির। গৈরিকা-কে বাহন করে তাঁদের রাজনৈতিক ভাবনার

পরিষ্কৃতন ঘটে। পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন বহির্ভূত মর্যাদা নিয়ে গৈরিকা সোচ্চার হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনে ঘোষিত ‘এক্সক্লুডেড এরিয়া’ ধাঁচের শাসন পদ্ধতি এবং সমতল জেলায় প্রচলিত অর্ধ-গণতান্ত্রিক, প্রতিনিধিত্বশীল শাসনপদ্ধতি— এ দুয়ের ফারাক তারা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিল। কিন্তু তিন রাজার অভ্যেদ্য দুর্গ ভেদ করে, জনতার উপর তাদের অসীম প্রভাব চূর্ণ করে এবং সবশেষে ব্রিটিশসরকারের আইনী বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে তাঁদের পক্ষে কিছু করা ছিল সত্যিই দুঃসাহসিক ও দুর্লভ কাজ। আইনের দৃষ্টিতে বেআইনী, উপজাতীয় রীতি-নৈতিকতা ও সামাজিকতার দৃষ্টিতে ধৃষ্টতা প্রদর্শন। তবুও তাদের কলম খেমে থাকেনি। গৈরিকার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক লেখালেখির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম এম.এ. ডিখীধারী কুমার কোকনদাক্ষ রায়ের লেখাই মর্মস্পর্শী, যুগভেদী। তিনি তৎকালীন পার্বত্য জেলায় প্রচলিত শাসন পদ্ধতি এবং ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা কিরূপ হতে পারে তার একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন গৈরিকার ১০ম সংখ্যায় ‘বিপুল সুদূর’ প্রবন্ধে। তিনি ‘এক্সক্লুডেড এরিয়া’ রূপ শাসন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে সাহস করে বলেছেন:

একটি সত্য আমাদের সকলকেই মনে নিতে হবে; আমাদের দেশ ভারতের নবশাসন ব্যবস্থার ফলে যে “এক্সক্লুডেড এরিয়া” রূপে পরিণত হয়েছিল তাতে আমাদের দেশ উন্নতির দিকে এই ক’টি বৎসরেও বিন্দু মাত্র এগিয়ে যায়নি— সুতরাং বুঝতে হবে “এক্সক্লুডেড এরিয়া” রূপ শাসনব্যবস্থা আমাদের পক্ষে অমঙ্গলের—। এখন বুঝতে হবে সেই উন্নতির দিকে যদি এগিয়ে যেতে হয় কি প্রকারের শাসনব্যবস্থা এদেশে প্রচলন করতে হবে। সেই উন্নতির অগ্রদূত হবে দেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং সেই আমূল পরিবর্তনের মূলে থাকবে বর্তমান ইউরোপীয় শাসনব্যবস্থা মডেল-রূপে এবং সেই শাসনব্যবস্থার সর্ব প্রথম আদর্শ হবে কনস্টিটিউশন্যাল গভর্নমেন্ট বা বর্তমান ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী। পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করতে হবে। সেই তিনটি রাজ্য হবে ১) চাকমা রাজ্য ২) বোমাং রাজ্য ৩) মংরাজ্য। এই নবশাসনতন্ত্রের তিনটি স্টেট এর রাজারা হবেন ইংলণ্ডের অনুকরণে Constitutional Ruler বা Chief। তিনটি রাজ্যে প্রজাদের নিজেদের ব্যবস্থাপক সভা থাকবে এবং মন্ত্রীর সভা বা Cabinetও থাকবে— তবেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রকৃত পথে Self Government দেওয়া হবে। ভারতের অন্য প্রদেশে মুসলমান জাতি দাবী করে মুসলমান রাজ্য— হিন্দু দাবী করে হিন্দুরাজ্য— শিখজাতি দাবী করে শিখ রাজ্য— দ্রাবিড় জাতি দাবী করে দ্রাবিড় রাজ্য— তবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও চাকমা জাতি কেন স্বাধীন চাকমা রাজ্য,— বোমাং কেন বোমাং রাজ্য এবং মং কেন মং রাজ্য দাবী করবে না। . . . ভারতে ইংরেজ শাসনের চরমলক্ষ্য হচ্ছে ভারতকে Self Government বা Dominion status বা Indepence দেওয়া এবং যদি তাই হয়ে থাকে তবে সর্ব প্রথমেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে Self Government দেওয়া কর্তব্য কারণ ভারতের অন্য প্রদেশের মত এদেশে হিন্দু মুসলমান-শিখ-দ্রাবিড় জাতির সমস্যা নেই।^{২৭}

কুমার কোকনদাশ্ফ রায় বাংলা সাহিত্যের কৃতবিদ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ তাঁর কতটুকু ছিল তা জানা যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বহির্ভূত শাসনব্যবস্থা যে তাঁর দেশের মানুষের জন্য কোনো উন্নতিসাধন করেনি তা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছেন। এটাও বুঝেছেন ব্রিটিশ ভারতের একই রাজনৈতিক সীমায় থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনিক ও শাসনতান্ত্রিক মারপ্যাঁচে তাঁর অঞ্চল কতটুকু পশ্চাৎপদ অবস্থাই ছিল বলতে গেলে যে তিনি সেই তিনিই হয়ে গিয়েছিল। অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়নকালে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন রাজনৈতিক বিচারে কলকাতা কতদূর অগ্রসর হয়েছে। তাদের আইনসভা হয়েছে, মন্ত্রীসভা হয়েছে, আইনসভায় তাদের চাহিদামাফিক আইন পাস করেছে। সাধারণ মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সুভাষ বসুর মতো বাঘা-বাঘা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হচ্ছে। মাঠে ময়দানে জনভায় শত সহস্র লোক জমায়েত হয়ে তাদের স্বাধিকারের দাবি জানাচ্ছে, স্বাধীনতার কথা বলছে— প্রভৃতি ঘটনা তার চোখের সামনেই ঘটে গেছে। কিন্তু সেখান থেকে মাত্র কয়েকশ মাইল দূরে তার মাতৃভূমির চিত্রপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই তিনি উপর্যুক্ত স্বপ্নের কথা অকপটে আওড়িয়ে গেছেন যে তাদেরও রাজ্য হবে, আইনসভা হবে, মন্ত্রীসভা হবে, নিজেদের প্রয়োজনীয় আইন নিজেরাই পাস করবে। তাঁর দাবিগুলি বড্ড আবেগময় মনে হয়। কেননা কলকাতা সেগুলো লাভ করেছে সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে। আর তার মানুষজন তো মিশিল, জনসভা, আন্দোলন কি জিনিস সেটিও জানে না। ফলে তার এ আবেগঘন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাটি বাস্তবে ধরা দেয়নি। তবে তিনি এটিও বলেছেন: “তিনটি রাজ্য না জুটলে পরে যেন কোনো অবস্থাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা পর্বত, লুসাই পর্বত ও চীন পর্বতের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া না হয়। সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গলাদেশের শাসনব্যবস্থার অধীনে যাওয়াই মঙ্গল, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্য আমরা বাঙ্গলাদেশের সঙ্গেই স্থাপিত করব তাতে যদি আমাদের সমস্ত জাতিই লুপ্ত হয়ে যায় তবুই ‘এক্সক্লুডেড এরিয়া’ রূপ শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা সুখে থাকব এবং বঙ্গদেশের শাসন ব্যবস্থা আমাদের মঙ্গলের হবে।”^{২৮}

উপর্যুক্ত মন্তব্য থেকে বুঝতে বাকি থাকে না যে ‘নন-রেগুলেশন জেলা’, ‘বাকওয়ার্ড এলাকা’ ‘বহির্ভূত এলাকা’ – এসব ওপনিবেশিক ডিসকোর্স তাদের কাছে কত অসহ্য, কত ঘৃণিত বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তাই তিনি সমস্ত জাতির বিলোপ হলেও ঐ রূপ শাসনে ফিরে যাওয়ার অনিহার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। এখানে বঙ্গদেশের শাসনব্যবস্থা আমাদের মঙ্গলের হবে বলে তিনি যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা তিনি তাঁর জীবদ্দশাই কতটুকু দেখে গেছেন বলা সম্ভব নয়।

১৯৪৭ সালে যখন দেশ বিভাগের কথা ভারতের আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল তখন তাঁর পার্বত্য চট্টগ্রাম শতাব্দীকালে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়ে লেগেছিল। ১৯৪৭ সালের সেই উত্তাল সময়ে কোকনদাক্ষ রায়ের “পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ-সংঘ” নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় গৈরিকার ১২শ বর্ষ ১৩শ সংখ্যায়। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া শিক্ষিত শ্রেণীর কর্মকাণ্ডের উপর এটি সর্বশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ রচনা। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্বৎসমাজের সভ্যগণ হিন্দু ও মুসলমান পরিচিতির ভিত্তিতে দেশভাগাভাগির সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারত ইউনিয়নে রাখার জন্য এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তোড়জোড় শুরু করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারিতে তাঁরা গঠন করেন ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ সংঘ বা হিলম্যান এসোসিয়েশন’।^{২৯} এ সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল:

১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বশ্রেণীর পাহাড়ী জাতির রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও জাতীয় দাবী পূরণার্থে স্বাধীন ভারতের নূতন শাসন ব্যবস্থা অনুসারে শাসনকার্যে পূর্ণাধিকার লাভ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমতানুসারে তিন সার্কলের রাজাসহ শাসনকার্য পরিচালনা।

২। পাহাড়ীগণের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জাতীয় রীতি নীতি সংরক্ষণ।

৩) পাহাড়ী জাতির সর্ব প্রকার উন্নতিমূলক পস্থা অবলম্বন।

১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল ভারতীয় গণপরিষদের এক্সক্লুডেড এরিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি রাংগামাটি আসলে তাদের দাবিনামা উত্থাপন করেন। তারা বলেন: “পাহাড়ী গণসংঘ উপলব্ধি করেছে যে এই মুষ্টিমেয় পাহাড়ী জাতিকে বাঁচাতে হলে নিজেদের শাসনভার নিজেদের অধিকারে আনতে হবে। দায়িত্বশীল রাজযুক্ত শাসনতন্ত্রই এই পাহাড়ী বাহিনীর সর্ব প্রথম দাবী।”

উপরের আলোচনায় দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্বৎসমাজ গৈরিকার মাধ্যমে তাদের অব্যক্ত ভাবনা গুলো প্রকাশ করে আমজনতার মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে জনমত তৈরীর চেষ্টা করতেন। সুতরাং, ‘গৈরিকা’র চিন্তা ও কর্মের পরিধি শুধু সাহিত্য চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের রাজনৈতিক দাবি দাওয়ার কথাও প্রকাশ করে তার রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করেছিল।

শিক্ষা ভাবনা

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করলে এ ধারণা জন্মে যে ব্রিটিশ আমলে পার্বত্য রাজা বা তাদের সহযোগী দেওয়ানগণ শিক্ষাবিস্তারের জন্য কোনো উদ্যোগ নেননি। এভাবে তাঁদের চরিত্রের শিক্ষাবিদ্বেষী, প্রগতিবিমুখ দিকটি প্রবলভাবে চিত্রিত করা

হয়। কিন্তু গৈরিকা-য় প্রকাশিত কিছু কিছু লেখা আমাদেরকে এ ব্যাপারে বিপরীত তথ্য দেয়। গৈরিকা জন্ম থেকেই শিক্ষা বিষয়ক সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছে। প্রতিবছর যারা ম্যাট্রিকুলেশন, আই.এ., বি.এ., ডিগ্রী অর্জন করতেন তাদের নাম গৈরিকা-য় প্রকাশ করা হতো এবং কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হত। যেমন ৩য় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কুমারী মনোরমা দেওয়ান প্রথম নারী হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়। গৈরিকা লিখেছে:

পার্বত্য মহিলার মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই পরীক্ষায় সফলতা লাভ করিলেন। তাঁহার কৃতিত্বের জন্য আমরা পার্বত্যবাসীরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আমাদের বিশ্বাস তাঁহার উচ্চ শিক্ষার দৃষ্টান্ত দর্শনে পার্বত্য প্রদেশে নারী শিক্ষার আশ্রয় বর্ধিত হইবে।^{৩০}

গৈরিকা রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হতো। সুতরাং শিক্ষা নিয়ে কোনো বৈষম্যমূলক নীতি তাদের অন্তরে নিহিত থাকলে গৈরিকা-য় ফলাও করে কৃতি শিক্ষার্থীদের কথা ছাপা হতো না। গৈরিকার ৫ম সংখ্যা আমাদেরকে আরো চমকপ্রদ সুখকর সংবাদ দিচ্ছে: “সকলেই জানিয়া সুখী হইবেন যে বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামেই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। শতকরা ১০.৫ জন।” এর অর্থ দাঁড়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষা ও স্বাক্ষরতা ক্ষেত্রে ক্রমশ উন্নতি লাভ করছিল। সমাজের কর্তব্যজ্ঞদের সানুগ্রহ সদিচ্ছা ছাড়া তা সম্ভবপর ছিল না বৈকি।

অধিকন্তু গৈরিকা-র মাধ্যমে জানা যায় তৎকালীন ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব গণবাধা চিন্তার মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখেননি। রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৩৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম ছাত্র সমিতি গঠিত হয়। রাংগামাটি রাজভবনে অনুষ্ঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতির প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন যেখানে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে কুমার বিরূপাক্ষ রায় ও রাজা নলিনাক্ষ রায়। শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের উদীপনাময় বাণী আমাদেরকে আশ্বস্ত করে। প্রথমে উল্লেখ করতে হয় গৈরিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রাণী বিনীতার “গৃহে নারী” নিবন্ধটির কথা। তিনি নারীশিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, “সাধারণভাবে এখনকার মধ্য ইংরেজী শিক্ষা পর্যন্ত দরকার, আরো করতে পারলে যথেষ্ট। কারণ বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাতে কিছু ইংরেজীও শিক্ষা লাভ করা যায়। আজকালকার দিনে আমরা যখন ইংরাজ গভর্নমেন্টের অধীনে আছি তখন মোটামুটি ইংরাজী ভাষা জানা আমাদের সকলেরই একান্ত প্রয়োজন। এই ইংরাজী বিদ্যা না জানা থাকায় আমারই একজন আত্মীয়া অনেক বছর পূর্বে যে ভীষণ ভুল করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর সন্তানকে পর্যন্ত হারিয়েছিলেন।... সেই জন্যই আজকালকার প্রতি ঘরের বধুর কিছু কিছু ইংরাজী জানা অতি আবশ্যিক।”

গৈরিকার পঞ্চম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যায় রাজা নলিনাক্ষ রায়ের “পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি ও শিক্ষা” শীর্ষক ভাষণটি প্রকাশিত হয়। ঐ ভাষণ পাঠ করলে রাজার শিক্ষাচিন্তা সম্বন্ধে ধারণা লাভ সহজ হয়। তিনি বলছেন:

আমাদের অনুন্নত পার্বত্য প্রদেশের ছাত্র সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং মঙ্গল আমি চিরদিনই কামনা করেছি— নানাভাবে নানাদিকে যাতে তোমাদের উন্নতির পথ সুগম ও স্বচ্ছল হয় তাই আমি চেষ্টা করে এসেছি এবং ভবিষ্যতে করব। ছাত্র সম্প্রদায় চিরদিনই আমার স্নেহের পাত্র, তাদের উন্নতি আমায় দেবে আনন্দ, তাদের সুশিক্ষা দেখে আমিই হবো অধিকতর সুখী, কারণ এই সুশিক্ষার ভেতর দিয়ে তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের দেশকে, তখনই শুধু বুঝতে পারবে তোমাদের প্রকৃত মঙ্গল কোথায়— তখনই জানতে সক্ষম হবে কোন্ পথ দিয়ে জাতীয় জীবনের শ্রোতকে প্রবাহিত করতে হবে। সে সম্বন্ধে যদিও তোমরা আজও তরুণ, তবুও তোমাদের ওপরেই নির্ভর করবে দেশের মঙ্গল; একদিন তোমরাই হবে জাতির স্তম্ভ। দেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য জীবনের প্রথম প্রভাত হতেই তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে— সে সুযোগ আজ তোমরা পেয়েছ। শিক্ষা বিস্তারের পথ তেমন সহজ ও সুলভ নয়— বিপুল অর্থ, সহানুভূতি, দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ, তবুও আমাদের নিরাশ হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আমাদের দেশ উন্নতির দিকেই চলেছে— তার প্রমাণ প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব লাভ করছে। আমাদের আরো উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন। সে চেষ্টা একতাবদ্ধ হয়ে সমগ্র দেশকেই করতে হবে, তার পথে সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করে আমরা চলে যাবো। পৃথিবীর সত্যবাণীই আমাদের চালিত করবে।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত শ্রেণীর শিক্ষাদর্শন— এর ধারণা স্পষ্ট হয় যে তারা কোনো কালেই শিক্ষার মতো অত্যাৱশ্যকীয় মানব প্রগতির উপাদানটির প্রতি বীতরাগ ছিলেন না। তাঁরা শুরু থেকেই আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বীয় পরিমণ্ডলে তা গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। শুধু বাচনিক উৎসাহতেই তারা ক্ষান্ত ছিলেন না, ছাত্রদের জন্য রাজপরিবার থেকে বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজা নলিনাক্ষ রায় তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন: “উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য এ বৎসরের জন্যে আমি মাসিক ১০ টাকা হিসাবে একটি বৃত্তি দিতে ইচ্ছা করি। আশা করি যোগ্য ছাত্রই এই বৃত্তি ভোগ করবে।”^{৩১}

এভাবে সরকারের পাশাপাশি রাজপুরুষগণকেও অনুন্নত পার্বত্য জেলায় শিক্ষা বিস্তারের মতো মহৎ কাজে ব্যাপ্ত হতে দেখা যায়। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য দেশে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়।

১৩৮৭ বঙ্গাব্দে ‘গৈরিকা’-র ষষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি’ তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির প্রদত্ত ভাষণ ছাপা হয়। সভাপতি হিসেবে সারগর্ভ,

উদ্দীপনাদায়ক ভাষণটি প্রদান করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্বৎ সমাজের কর্ণধার কে. কে. রায়। তাঁর ভাষণের কiyদংশ এখানে তুলে ধরা হলো:

জাতীয় জীবনের এমনি পতনের দিনেও আমাদের বাঁচতে হবে এবং বাঁচবার এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে সঙ্গবদ্ধভাবে মিলিত হয়ে দেশকে উন্নতির পথে চালিত করার পথকে বেছে নেওয়া। “Unity is Strength” বা “একতাই বল” বলে একটা কথা আছে এবং সে-সত্যটাই হবে সমগ্র পার্বত্য দেশের মন্ত্র। ব্যক্তিগত স্বার্থকে ছোট করে, দুঃখকেও কিছু বরণ করে আমাদের মিলিত হয়ে শিক্ষা বিস্তারের তহবিলের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেও দেশের দরিদ্র ছাত্র সমাজকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে— প্রতি বৎসর তাদের ভারতের বাহিরেও উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ আদর্শের জন্য পাঠাতে হবে— তারাই ফিরে এসে দেশকে উন্নতির পথে চালিত করবে। শিক্ষিত তরুণের কাছেই আমাদের দীক্ষা নিতে হবে। তবেই প্রগতির সাথে সমান তাল রেখে চলতে পারব, না হয় আমাদের কিছুতেই উন্নতি হতে পারে না। ...সমস্ত জাতির দুঃখ দৈন্য দূর হয়ে যাবে সেই মুহূর্তেই যখন পার্বত্য দেশের ঘরে ঘরে থাকবে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি। তারা শক্তিকে ফিরে পাবে। দেশের মঙ্গলকে দেখতে পাবে, সত্যকে সত্য বলে বুঝতে পারবে— তখনই দেশে ফিরে আসবে সুখ ও শান্তি। আরব্য উপন্যাসের মত এক রাতে দেশের ছবি বদলে যাবে। ফিরে আসবে আমাদের দেশে বহু শতাব্দীর হারানো সুরটী। দেশের মুক্তি শুধু উচ্চ শিক্ষার ভেতরই।^{৩২}

উদ্ধৃতাংশটিতে উচ্চশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সীমিত। তাই তহবিল সংগ্রহ করে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। আট দশ জন শিক্ষিত জনের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিতদের মধ্যেও শিক্ষার মাধ্যমে প্রগতির পথে চলার চেতনার উন্মেষ ঘটেছে।

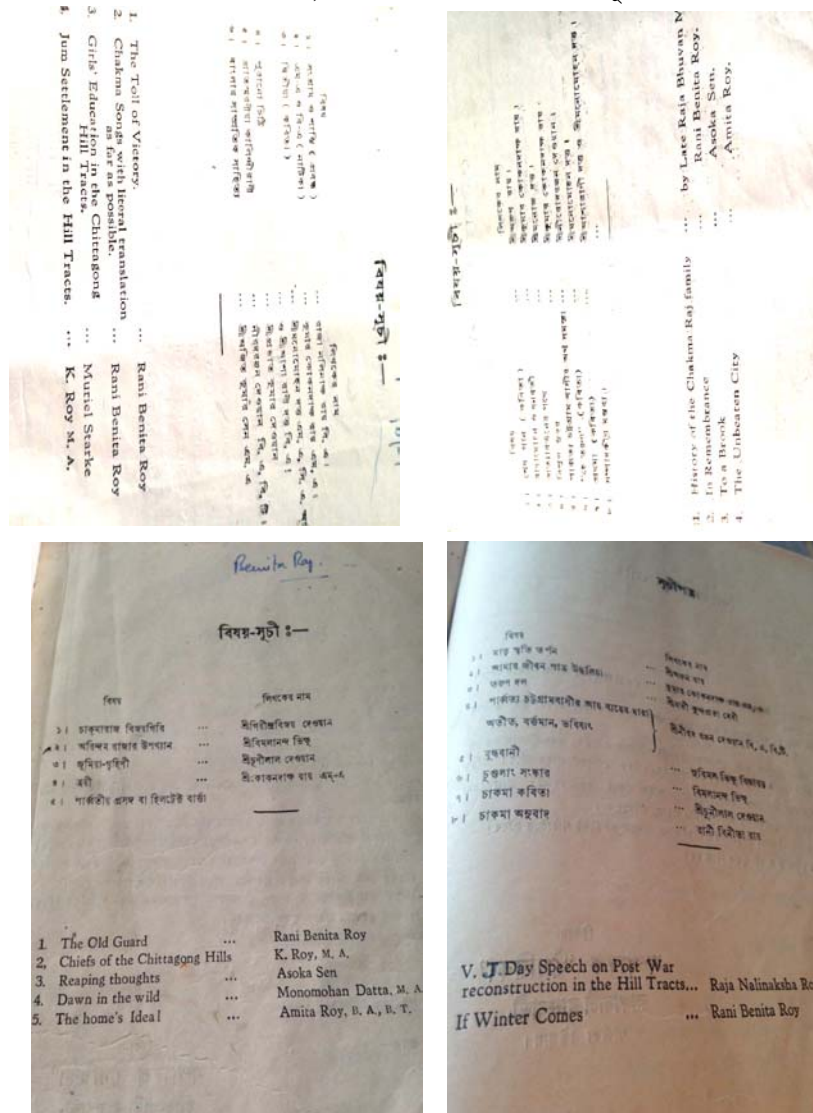
অতএব এ কথা নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে বিভাগ পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত সমাজের শিক্ষাচিন্তা ছিল প্রগতিশীল এবং গণমুখী।

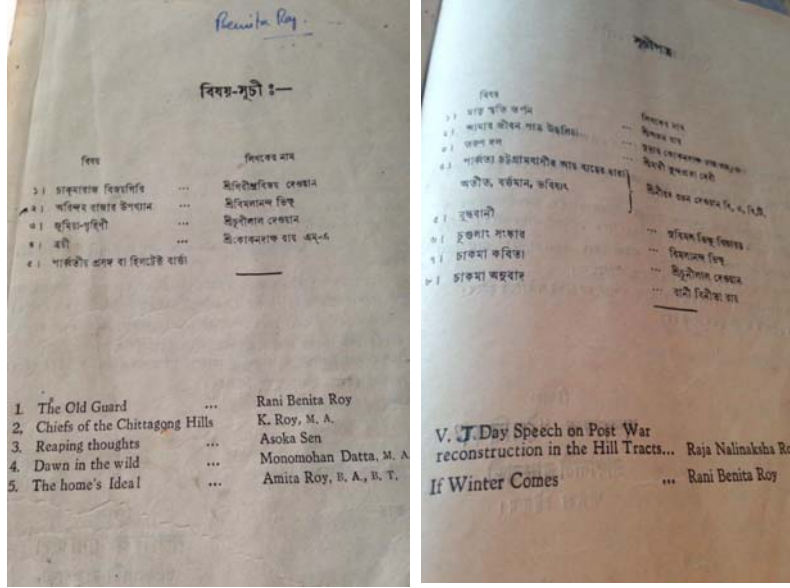
পরিশেষে এটি বলতে দ্বিধা নেই যে ১৯৩৬-১৯৪৭ সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য চর্চা ও সাময়িক পত্র প্রকাশনার ইতিহাসে একটি বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল গৈরিকা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। গৈরিকায় প্রকাশিত লেখাগুলির মান নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবাস্তব যদি আমরা সেখানকার প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশ, সাবেকী অর্থনীতি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করি। বরং এটি বলা যায় গৈরিকা একটি অনন্যসাধারণ সাময়িক পত্রিকা এজন্য যে পত্রিকাটিতে বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষায় লিখিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলা, ভারত ও তাবৎ বিশ্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ছাপানো হতো

গৈরিকা-য়। যার ফলে স্থানীয় পত্রিকা হলেও এটি বৈশ্বিক খবরাখবর যোগান দিত। পত্রিকা পরিচালনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনার জগতে একদম নতুন হলেও রাণী বিনীতা রায় এবং সম্পাদকদ্বয় (প্রভাত কুমার দেওয়ান বি.এ. ও কবি অরুণ রায়) যে অপরিসীম ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে পত্রিকাটির প্রকাশনা পনেরো বছর যাবৎ চালু রেখেছেন তা সত্যি প্রশংসনীয় কর্মযজ্ঞ। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় কোনো ছাপাখানা ছিল না। দুর্গম গিরি কান্তার মরু অতিক্রম করে নানা চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে তাঁরা প্রসববেদনার মতো ক্লেশ-যাতনা সহ্য করে সুদূর চট্টগ্রাম থেকে পত্রিকাটি মুদ্রণ করতেন প্রতি বছর। পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনা যেকোনো ব্যক্তি-সমাজের চিন্তা-চেতনার উচ্চতর স্তরকেই নির্দেশ করে। আর সাহিত্যানুশীলন যে গভীর মননশীলতার প্রতীক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং, সামগ্রিক বিচারে ‘গৈরিকা’ প্রকাশ পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চমাগী় চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ। আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করে প্রগতির মিছিলে সামিল হবার নন্দিত প্রয়াস হলো গৈরিকা প্রকাশনা। সেই পরাধীন যুগের প্রেক্ষিত বিচারে ম্যট্রিকুলেশন থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষিত শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও জনহিতৈষী কীর্তিকর্মকে যদি বিদ্বৎসমাজী কাজ বলে গণ্য করা হয় তাহলে ১৯৩৬-১৯৪৭ সময় পর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামেও সেই সমাজের অস্তিত্ব ছিল— যদিও আকারে লক্ষণীয়ভাবে ছিল ক্ষুদ্র। কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র হলেও তাদের চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে যে স্বদেশলগ্নতা, স্বসমাজলগ্নতা নিহিত ছিল গৈরিকা-য় প্রকাশিত উপর্যুক্ত বিশ্লেষিত ভাবনাগুলোই তার সাক্ষী। তাঁদের অর্থনৈতিক ভাবনা, রাজনৈতিক ভাবনা ও শিক্ষাভাবনা সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা তারই একনজর দেখলাম। তাই বলতে দ্বিধা নেই যোল আনা জুমচাষ নির্ভর জীবনবোধ ও নিছক জীবনধারণ অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার অচলায়তন ভেঙ্গে দিয়ে গৈরিকা পার্বত্য চট্টগ্রামে পত্রিকা প্রকাশনা, আধুনিক সাহিত্য চর্চা ও লেখনী চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সাহিত্য সাময়িক পত্র পরিচালনা ও প্রকাশনায় রাণী বিনীতা রায়ের এ অক্ষয়, অসামান্য অবদানের জন্য রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ২০০১ সালে তাঁকে মরণোত্তর সম্মাননায় ভূষিত করে।^{৩০}

পরিশিষ্ট

গৈরিকার প্রচ্ছদ, নিয়মাবলী ও কয়েকটি সংখ্যার সূচিপত্র





তথ্যনির্দেশ

- ১ Hutchinson wrote: "The history of education in the Chittagong Hill Tracts commences with the foundation of a boarding school at Chandraghona in October 1862. At this school elementary education was imparted to the hill boys. In the former Burmese, English and Bengali were taught, while in the latter only English and Bengali. ... The success of the school prompted the authorities in December 1890 to raise the status to that of a High English School. The school has succeeded in passing twenty-two boys in the Entrance Examination, of whom thirteen, however were Bengalis. Amongst the eight successful hill boys are Chakma Chief and his brother." see R. H. Syned Hutchinson, *An Account of Chittagong Hill Tracts*, (Calcutta, Bengal Secretariat Book Depot, 1906), pp. 76-77
- ২ রাঙ্গামাটির প্রবীণ লেখক ও পুস্তক সংগ্রাহক শ্রী বিজয় কেরন চাকমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে ৪টি, রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে ১ টি এবং সিলেট নিবাসী অধ্যাপক নন্দলাল শর্মার নিকট থেকে থেকে ১টি এবং লন্ডন প্রবাসী রাণী বিনীতা রায়ের নাতনী শ্রীমতি উজ্জয়িনী রায় থেকে ৪টি সংখ্যার সূচিপত্র ও দুটি ইংরেজি প্রবন্ধ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর সংগ্রহে থাকা পুরো চারটি সংখ্যা সংগ্রহের চেষ্টা অব্যাহত আছে।
- ৩ ইসরাইল খান, *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৫, পৃ. ১১১
- ৪ মাসিক পূর্বী পত্রিকার কয়েকটি কপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দুস্তাপ্য শাখায় সংরক্ষিত আছে।
- ৫ পূর্বী, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৪
- ৬ Muhammad Ishaq, *Bangladesh District Gazetteers: Chittagong Hill Tracts*, Dhaka: Bangladesh Government Press, 1975, p. 233

- ৭ রানি বিনীতা রায়, “স্মরণিকা” বিরাজ মোহন দেওয়ান (সম্পা.) পার্বত্য বাণী, দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, মে ১৯৬৯, রাংগামাটি
- ৮ বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা.) শ্রী মাধবচন্দ্র চাকমা কর্ম্মী, শ্রীশ্রীরাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৬৭। শ্রী কর্ম্মী লিখেছেন: “যুবরাজ শ্রীযুত নলিনাক্ষ রায়ের সহিত রাঙ্গামাটি রাজপ্রাসাদে ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ ইংরাজীতে (২৭ শে মাঘ) প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক অদ্বিতীয় বক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পুত্র ব্যারিস্টার সরল চন্দ্র সেনের প্রথম কন্যা (ব্যারিস্টার পি সি সেনের কন্যা নির্মালা সেনের গর্ভজাত) শ্রীমতী বিনীতা দেবী সহিত শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।”
- ৯ বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সম্পা.) শ্রীমাধবচন্দ্র চাকমা কর্ম্মীর শ্রীশ্রীরাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস, ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী, সংশোধিত নবযুগ সংস্করণ, ২০০৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, পৃ. ৬৯
- ১০ নন্দলাল শর্মা, পার্বত্য চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা, রাংগামাটি: রাংগামাটি প্রকাশনী, ১৯৮৩, পৃ. ৯
- ১১ সম্পাদকীয়, গৈরিকা, বৈশাখ-১৩৪৩, প্রথম খণ্ড, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
- ১২ গৈরিকা, বৈশাখ, ১৩৪৩, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১
- ১৩ নন্দলাল শর্মা, প্রকাশনা পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতি, রাংগামাটি: প্রকাশক বিজয় কেতন চাকমা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫
- ১৪ তারারচরণ চাকমা, যুগ্ম সচিব (অব.) ‘শিক্ষার অগ্রগতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম’ সাপ্তাহিক বনভূমি, ৫ই নভেম্বর, ১৯৭৮
- ১৫ *Final report on the Settlement and Survey Operations undertaken in the Chittagong Hill Tracts between 1909-1926*, Government of Bengal, Typoscript Copy preserved in Official Library, Directorate of Land Records and Survey, Dhaka, 1926- এর তথ্যানুসারে মং সার্কেল-এ ৮৮টি এবং বোমাং সার্কেল-এ ১০৭ টি মৌজা গঠন করা হয়।
- ১৬ *Selections from the Correspondence on the Revenue Administration of Chittagong Hill Tracts, 1862-1927* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1929), p. 447
- ১৭ উদ্ধৃত, বিনয় ঘোষ, *বাঙালার বিদ্বৎ সমাজ*, কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৭৮, পৃ. ৮
- ১৮ নন্দলাল শর্মা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা*, পৃ. ৯
- ১৯ দেখুন, বিনয় ঘোষ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
- ২০ গৈরিকা, ৯ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫১
- ২১ গৈরিকা, ৯ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫১
- ২২ ঐ
- ২৩ ঐ
- ২৪ গৈরিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৪৮
- ২৫ ঐ, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৩
- ২৬ ৩য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫
- ২৭ গৈরিকা ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা মাঘ ১৩৫১
- ২৮ প্রাগুক্ত
- ২৯ গৈরিকা, ১২ শ বর্ষ, ১৩ শ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪
- ৩০ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।
- ৩১ গৈরিকা ৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৪৭
- ৩২ গৈরিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮
- ৩৩ *সম্মাননা- ২০০১ স্মরণিকা*, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাংগামাটি, ২০০১